অরণ্যের অধিকার ও আদিবাসীদের বঞ্চনার সালতামামি

অরুণ দাস

রাজ্য জুড়ে চলেছে আদিবাসীদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ধামাচাপা দিতে বামফ্রন্ট সরকার বলে চলেছে এ রাজ্যে আদিবাসীরা বঞ্চিত নয়, বাম জমানায় তাদের নাকি প্রচুর উন্নতি হয়েছে। লালগড় আন্দোলনের ধাক্কা সামলাতে সিপিএম নানাভাবে নিজেদের 'আদিবাসী বান্ধব' হিসাবে তুলে ধরতে ব্যস্ত। উন্নয়নের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের এসব দাবি কতটা অন্তঃসারশূন্য। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আদিবাসীসহ হতদরিদ্র মানুষেরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। চলেছে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, দলবাজি। আদিবাসী উন্নয়নের টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে অন্যত্র।

এমনকি আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়ার কাজেও পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্ত ব্যর্থ। বংশানুক্রমে অথবা টানা ২০ বছরের বেশি বনাঞ্চলে বাস করছেন এমন আদিবাসী পরিবারগুলির দখলে থাকা বাস্তু ও চাষের জমির অধিকার দিতে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ২০০৬ সালে আইন প্রবর্তন করে। এটি ''সিডিউলড ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ট্রাডিশন্যাল ফরেস্ট ডোয়েলার্স (রিকগনিশন অব ফরেস্টস রাইটস) নামে পরিচিত। সেই আইন অনুযায়ী এ রাজ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, কোচবিহার, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় বনবাসীদের পাট্টা দেওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পাট্টা বিলির কাজ শেষ করতে। পাট্টা প্রাপকদের বাছাই করতে এ রাজ্যে ২৭১০টি বন অধিকার কমিটি গঠিত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বেশির ভাগ কমিটি-ই শাসকদল দখল করে বিরোধী সমর্থকদের দরখাস্তগুলো আটকে দিয়েছে। এর ফল ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য, যেহেতু কোন পরিবার কোন জমিতে কত বছর বসবাস করছে সে ব্যাপারে ঐ কমিটির বক্তব্যই শেষ কথা। এ নিয়ে গত ১৯শে ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনিপুর জেলাশাসকের সামনে বিক্ষোভ ও দেখান কয়েকশো আদিবাসি। নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ১ লাখ ১৬ হাজার দররখাস্ত জমা পড়েছে। বহু মানুষ এখন পর্যন্ত জানেনই না এ প্রকল্পের কথা। জমা পড়া দরখাস্ত খতিয়ে দেখে এখন পর্যন্ত মাত্র ২৬ হাজার পাট্টা বিলি করা হয়েছে।

২০০১-এর জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যের মোট ৮,০১,৭৬,১৯৭ জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী জনগণের সংখ্যা হল ৪৪,০৬,৭৯৪। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫.৫ শতাংশ।

২০০১ -এর সেনসাস অনুযায়ী রাজ্যের তপশীলী উপজাতিদের মধ্যে ৫৬.৬০ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর। (যেখানে জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার ৬৮.৬৪ শতাংশ) আদিবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার আরও করুণ।

রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিসি ডবল্যু (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার) ডিপার্টমেন্ট নানা প্রকল্পের মাধ্যমে তপশীলী উপ জাতিভুক্ত মানুষের উন্নয়ন ও আর্থিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের তথ্য থেকে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যসরকার নামমাত্র অর্থ খরচ করে। যে সব প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়া গেছে সে সব প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের খরচের হিসেব সরকারি নথি থেকে পাওয়া যায় না। টি-এস-পি-২ (ট্রাইবাল সাব প্ল্যান-২) -এর ২০০৮ - ০৯ এর ফলাফল লক্ষ করলে দেখা যায় লক্ষমাত্রার ক্ষেত্রে অনেক কম সাফল্য পাওয়া গেছে এই প্রকল্প থেকে।

সারণী - ১
বার্ষিক যোজনা - টি এস পি-২

প্রধান খাত	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সাফল্য
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প			
প্রশিক্ষিত মানুষ	সংখ্যা	৭৮	৩১
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প			
ক্ষুদ্রশিল্প	সংখ্যা	৫০০০	৫১৬
হস্তশিল্প	সংখ্যা	২০০০	৩৫৯
খাদি ও গ্রামীণ শিল্প	সংখ্যা	৯৫০০	নেই
ছোবড়া শিল্প	সংখ্যা	৪০০	৪৪
রেশম চাষ	সংখ্যা	৬০০০	৪৭৯৩
পরিবহন			
রাস্তা ও ব্রিজ	কি.মি.	৭০০	৫৬৮
কৃষি ও আনুষাঙ্গিক কাজ			
গুরুত্বপূর্ণ উচ্চরলনশীল বীজ বন্টন	সংখ্যা	২০০০০০	১০০০
পশুপালন			
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	লক্ষ্য	১৫.০	৭.৫৬
মৎস চাষ			
মৎস্যচাষের উন্নয়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়ন	জনসংখ্যা	১৮০০০০	২৯৩০৬
কৃষি বাণিজ্য			
গুদাম তৈরির জন্য ক্ষুদ্র চাষিকে ভর্তুকি	সংখ্যা	৫০০	১৭২
সংযোগ সড়ক	কি.মি.	৩০	২০
শিক্ষা			
আশ্রম হোস্টেল নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন	সংখ্যা	১০০০	৬৯৯
প্রাইমারি স্কুলের লাগোয়া আশ্রম হোস্টেল খোলা	সংখ্যা	১০০০	৫২৫
সমাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ			
নবম শ্রেণির নীচে প্রতিবন্ধীদের স্কলারশিপ	সংখ্যা	১৯৬৫	৯৬০
দুঃস্থ বিধবার পেনশন	সংখ্যা	৩৮৭	১৬৬
তিন বছরের নীচের শিশুদের পরিপূরক পুষ্টি	সংখ্যা	২৯০০০০	নেই
আই সি ডি এস প্রকল্প গঠন	সংখ্যা	৫৬৭৬০	৮৬২৫
প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম অঙ্গ দিয়ে সহায়তা	সংখ্যা	৩০০	১৬
অর্থনৈতিক পুনর্বাসন মঞ্জুরি	সংখ্যা	২০৭০	১০৬৪

এ রাজ্যে বহুফসলি জমিতে শিল্প গড়তে সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে ঘাটতি একটি রাজ্য। নিরুপম সেন তাঁর একটি বইতে একথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাজ্যে খাদ্যে ঘাটতির পরিমাণ ৩৪হাজার টন। পঞ্চায়েত দপ্তরের মুখপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ভালো করে বাঁচার সামান্যতম রসদও জোটে না এ রাজ্যের ৪৬১২টি গ্রামে। এ সব গ্রামের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কয়েকটি প্রকল্পে গ্রামগুলিকে উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দলীয় নেতা - কর্মীদের ব্যাপক কারচুপিতে তাও সম্ভব হচ্ছে না।

পঞ্চায়েত দপ্তরের মুখপত্র 'পঞ্চায়েত রাজ' -এর সপ্তম সংখ্যায় বলা হয়েছে ২০০১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৯৯ শতাংশেরও বেশি পিছিয়ে পড়া গ্রামের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি তফসিলি জাতি বা আদিবাসী। কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের ৫০ শতাংশের বেশি কৃষিশ্রমিক। গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনসাধারণকে কাজ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন ২০০৫' NREGA প্রকাশ করে। যার সাহায্যে গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষদের বেশ খানিকটা অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে (NREGA) আদৌ আশানুরূপ সাফল্য পায়নি।

মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত রাজ্যে মোট গ্রামীণ পরিবারের ১,২৫,০১,৪৫৪টির মধ্যে কাজ চেয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার। কাজ পেয়েছে প্রায় ৩৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার। অর্থাৎ মোট গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ৩৩ শতাংশ কাজের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। ২০০৭-০৮ সালের তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলায় যত সংখ্যক পরিবারকে জবকার্ড ইস্যু করা হয়েছে তার সাপেক্ষে ৪৫.২৩ শতাংশ পরিবার কাজের চাহিদা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু যারা কাজের চাহিদার আবেদন করেছেন তার মধ্যে ৯৮.৪৪ শতাংশ পরিবার কাজ পেয়েছেন। প্রাপ্ত টাকার ৭৪.৬৬ শতাংশ তফশিলি উপজাতিভুক্তরা কাজ পেয়েছেন। প্রাপ্ত টাকার ৭৪.৭০ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। আর জবকার্ডধারীরা গড়ে কাজ পেয়েছেন মাত্র ২১ দিন।

মার্চ ২০০৮ -এর শেষে পশ্চিবঙ্গে NREGA -র মোট শ্রমদিবসের ৩৬.১১শতাংশ তফশিলি জাতিভুক্তরা এবং ১৩.৬৬ শতাংশ তফশিলি উপজাতিভুক্তরা কাজ পেয়েছেন। NREGA তে বলা হয়েছে মোট উপকৃতদের এক তৃতীয়াংশ অবশ্যই মহিলা হবেন। সর্বভারতীয় স্তরে যেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার প্রায় ৪৩শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে গত অর্থবর্ষে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার মাত্র ১৬.০২ শতাংশ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের অবস্থা আর করুণ। জবকার্ডধারীরা এখানে গড়ে ১২ দিন কাজ পেয়েছেন। ১৫ কোটি টাকা পড়ে আছে, কাজ হয়নি। জেলার ২৯টি ব্লকের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের নির্বাচনী এলাকা গড়বেতা-১ ব্লকে সবচেয়ে বেশি টাকা পড়ে আছে। টাকার পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ১৬৭ টাকা। লালগড়ের ছোটপেলিয়া সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষ গড়ে মাত্র ৫ দিন কাজ পেয়েছেন।

ইন্দিরা আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি যে ব্যাপক অনিয়ম করেছে তা রাজ্য সরকারের বিশেষ অডিটে ধরা পড়েছে। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ একশো কোটিরও বেশি।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী মোট বরাদ্দ অর্থের ৬০ শতাংশ বিপিএল তালিকায় থাকা তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য খরচ করতে হবে। বাকি ৪০ শতাংশ বিপিএল তালিকায় থাকা অ-তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য। ২০০৫-০৬ সালে ৩৩৪৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে ৭৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো পরিকল্পনা তৈরি না করে ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। ১৬২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত যাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে তারা কেউই বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী ঘরের মালিকানা স্ত্রী বা স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই যৌথভাবে দিতে হবে। কিন্তু ২৪৮৪টি পঞ্চায়েত প্রায় ৩৩ হাজার ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মালিকানা দিয়েছে। এই খাতে নিয়ম ভেঙে প্রায় ৫১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

৩৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায ১৩ হাজার ক্ষেত্রে জমির মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও ১৯ কোটি টাকা খরচ করে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পের গাইড লাইন অনুযায়ী ঘর তৈরির সঙ্গে স্যানিটারি শৌচাগার ও ধোঁয়াহীন চুল্লি নির্মাণ করতে হবে। যদি তা না করা হয় এই খাতে মোট ৭০০ টাকা বাদ যাবে। ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে মোট ১৩৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৮৫২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৬৭ হাজার ৫৯৩টি স্যানিটারি শৌচাগার ও ৭৯ হাজার ১৫২টি ধোঁয়াহীন চুল্লি তৈরি করা হয়নি। এই খাতে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা বিলি নিয়ে সর্বত্র স্বজনপোষণ, দলবাজি ও নানা দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে।

শাসক দলের নেতা বা কর্মীদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দেওয়া হচ্ছে নির্বিচার, অন্যদিকে গরিব মানুষেরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ছবি সর্বত্র থেকে গেছে। এইসব মানুষদের সচেতনতার দায়িত্ব নিতে হবে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষকে, দরিদ্র মানুষকে জানাতে হবে বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে কী কী সুযোগ সুবিধা তাদের প্রাপ্য। সেইসঙ্গে সাহায্যও করতে হবে তাঁরা যাতে এই সব সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন। এরকম কিছু প্রকল্প নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

জাতিয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন

* কাজের নিশ্চয়তা একটি সর্বজনীন অধিকার। যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কাজের জন্য আবেদন করার অধিকারী। এই আইনে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারই (APL ও BPL সহ প্রতিটি পরিবার) কাজের অধিকারী।
* ইচ্ছুক পরিবার নাম নথিভুক্ত করুন। নথিভুক্ত প্রতিটি পরিবার জবকার্ড পাবেন। এতে আবেদনকারীর ফটো থাকবে। এর জন্য কোনো টাকা লাগবে না।

  আপনার জবকার্ড সবসময় আপনার কাছে থাকবে। এটা অন্য কারো কাছে থাকবে না।
* জব কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিরা কাজ পাওয়ার জন্য একক বা যৌথভাবে নির্ধারিত ফর্মে (৪ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে দরখাস্ত করবেন। এই ৪ক ফর্ম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
* আবেদন পত্র জমা নেওয়ার সময় প্রত্যেক আবেদনকারীর আবেদন প্রাপ্তির রসিদ দিতে হবে তারিখ সহ। মৌখিকভাবে আবেদন করলেও আবেদনপ্রাপ্তির রসিদ তারিখ সহ দিতে হবে। রসিদ না দেওয়া, বা তারিখ ছাড়া রসিদ দেওয়া গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে।

* দরখাস্ত করার অথবা যে তারিখ থেকে কাজ চাওয়া হচ্ছে তার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।
* সাধারণভাবে, আবেদনকারীকে কমপক্ষে টানা ১৪ দিনের কাজ দিতে হবে।
* যেদিন থেকে কাজ চাওয়া হচ্ছে সাধারণভাবে তার ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে কাজ দিতে না পারলে তিনি বেকারভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন। এর জন্য প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে সরাসরি দরখাস্ত করতে হবে।
* বেকারভাতা প্রথম ৩০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরির এক - চতুর্থাংশ হারে এবং ৩০ দিনের বেশি প্রাপ্য হলে বাকি দিনগুলির জন্য দৈনিক মজুরির অর্ধেক হারে দেওয়া হবে।
* শুধুমাত্র গ্রেড-১ পাশ স্বনির্ভর দলগুলিকেই প্রকল্পের সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।
* প্রত্যেক শ্রমিক তাদের কাজের পরিমাণ অনুযায়ী আনুপাতিক হারের মজুরি পাবেন।
* অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বর্তমানে ৭৫ টাকা, অর্ধদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বর্তমানে ১১২.৫০ টাকা ও দক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বর্তমানে ১৫০ টাকা।
* মজুরি প্রদানের সময় যে ব্যক্তি কাজ করেছেন কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই মাস্টাররোলে সই বা টিপসই করে মজুরি তুলতে পারেন।
* প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরি ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
* স্থানীয় মানুষ সামাজিক নিরীক্ষায় কর্মসূচির মূল্যায়ন করবেন। প্রতিটি সংসদেই সামাজিক নিরীক্ষা করতে হবে।
* যে কোনও সাধারণ ব্যক্তি এই কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনও রকম অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা জেলা যে কোনও স্তরে জানাতে পারেন।

গরিব ও কর্মহীন মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের রাস্তা খুঁজতে 'টোল-ফ্রি হেল্পলাইন' চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

দিল্লিতে খোলা হয়েছে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন (নম্বর: ১৮০০-১১০৭০৭) তাতে হিন্দি ও ইংরেজিতে কথা বলা যায়। পাশাপাশি , রাজ্যগুলিকেও স্থানীয় ভাষায় হেল্পলাইন খুলতে বলা হয়েছে। মাস দুই হল, পশ্চিমবঙ্গে তা চালুও হয়েছে (নম্বর ১৮০০-৩৪৫৪০৮৩) সোম থেকে শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই দুই নম্বরে ফোন করা যায়।

* **জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী :**

(ক) জাতীয় বার্ধক্যজনিত ভাতা প্রকল্প (NOAPS)

দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ (যাদের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি) মাসিক ৪০০ টাকা হারে বার্ধক্যজনিত অবসর ভাতা পাবেন।

এছাড়া যার প্রাণধারণের মতো নিজস্ব আয়ের উৎস নেই এমন ব্যক্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পরিবারে একমাত্র বৃদ্ধা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সাহায্যপ্রাপক ব্যক্তি আমৃত্যু সাহায্য পেতে পারেন। দরখাস্তের ফর্ম পঞ্চায়েত বা পৌরসভার অফিসেই পাওয়া যায়। ছাপানো ফর্ম না পেলে সাদা কাগজে দরখাস্ত করুন। মহকুমাশাসক আবেদন মঞ্জুর করেন।

(খ) জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্প (NFBS)

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান মারা গেলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এককালীন ১০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৃত উপার্জন কারীর বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যুর দু মাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে। ফর্ম পাওয়া যাবে পঞায়েত বা পৌরসভার অফিসে।

(গ) জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প (NMBS)

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সন্তানসম্ভবা মা তাঁর শরীরে পুষ্টিকর খাবার জোগানোর জন্য এই প্রকল্পের সাহায্য পেতে পারে। প্রথম দুটি জীবিত সন্তান প্রসব পর্যন্ত প্রতি গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে মা তাঁর শরীরে বাড়তি পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে এককালীন ৫০০ টাকা করে পেতে পারেন। গর্ভবতী মায়ের বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে। প্রসবের ১২ থেকে ৮ সপ্তাহ আগে এককালীন এই সাহায্য পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে এই সাহায্যের জন্য আবেদন করতে হবে। ফর্ম পাওয়া যাবে পঞ্চায়েত বা পৌরসভার অফিসে।

* **ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প**

কৃষিশ্রমিকের নামে বাস্তুসহ ৫০ ডেসিমিলের (.৫০ একর) বেশি জমি নথিভুক্ত না থাকলে তাকে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বলে।

১৮ থেকে ৫০ বছরের যে কোনো কৃষক এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারেন। এই প্রকল্পে কৃষি শ্রমিকরা প্রতি মাসে ১০ টাকা জমা দিলে সরকার সমপরিমাণে টাকা জমা দেবে। কৃষিশ্রমিকের বয়স ৫০ বছর হলে তখন তিনি সুদ সমেত তা ফেরত পাবেন।

মনে রাখুন : (১) পঞ্চায়েত অফিসে আবেদনের ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যায়। নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর কৃষিশ্রমিক টাকা জমা দেওয়া শুরু করলে একটি পরিচয় পত্র পাবেন। বছরের শেষে সুদসমেত কতটাকা জমল তা পঞ্চায়েত অফিস থেকে স্লিপ দিয়ে জানিয়ে দেবে।

(২) পরপর তিনমাস টাকা জমা না দিলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। ৫০ বছর বয়সের আগেই কোনো গ্রাহক মারা গেলেও তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীকে সঞ্চিত টাকা সুদসহ ফেরত দেওয়া হয়।

* **ইন্দিরা আবাস যোজনা**

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামে গরিব মানুষের বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গরিব (তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের) মানুষের বাসগৃহ দৈরি করে দেওয়া।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামে গরিব মানুষের বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গরিব (তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের) মানুষের বাসগৃহ তৈরি করে দেওয়া।

এই প্রকল্পে নতুন বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সমতল এলাকায় ২৫ হাজার টাকা, পাহাড়ি এলাকায় ২৭ হাজার টাকা এবং বাসগৃহ সংস্কারের জন্য উভয়ক্ষেত্রেই সাড়ে বারো হাজার টাকা দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ টাকা গরিব তফশিলি জাতি এবং আদিবাসীদের বাসগৃহের জন্য ও বাকি ৪০ শতাংশ অন্যান্য সম্প্রদায়ের গরিব মানুষের বাসগৃহের জন্য খরচ করা হয়।

দুই ক্ষেত্রে তিন শতাংশ টাকা গরিব প্রতিবন্ধীদের জন্য খরচ করার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সামাজিকভাবে নির্যাতিত ব্যক্তি, পরিবারের প্রধান হিসাবে বিধবা বা অবিবাহিত নারী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত পরিবার, উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবার,

শারীরিকভাবে অক্ষম ও দরিদ্র পরিবার, যুদ্ধে নিহত সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনীর, কর্মচারীর পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে যে বাড়ি তৈরি হয় তা পরিবারের মহিলার নামে বা স্বামী - স্ত্রী উভয়ের নামে বরাদ্দ করা হয়।

মনে রাখুন : এই প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা বা যাঁরা গৃহ পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান তাঁদের নামেই গৃহ বরাদ্দ হবে।

এছাড়া নারী ও শিশুবিভাগ ও সমাজকল্যান বিভাগে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ:

বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা :

দারিদ্র্য সীমার নীচের কোনও পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে কন্যা সন্তানের জন্য এককালীন ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। দুটি জীবিত কন্যা সন্তান পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যায়।

দুঃস্থ শিশুদের আর্থিক সাহায্য:

অনাথ ও খুব দুঃস্থ ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়িতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। অতি দরিদ্র পরিবারে বিদ্যালয়ে পড়ছে এমন পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেরা বা আত্মীয় স্বজনের কাছে থেকে বড়ো হচ্ছে এমন সব শিশুদের জন্যও আবেদন করা যাবে। পারিবারিক আয় হতে হবে ৭৫০ টাকার মধ্যে। ১৮ বছর পর্যন্ত মাসে ৬০ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। এছাড়া দুঃস্থ শিশুদের আবাসে রেখে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

ব্লক অফিসের ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে দরখাস্তের ফর্ম পাওয়া যায়।

অনাথ বিধবাদের জন্য ভাতা :

সমাজে যে বিধবারা খুব গরিব এবং যাদের দেখার কেউ নেই তাঁরা এই ভাতা পেতে পারেন। এই প্রকল্পে বিধবাদের ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। যে বিধবা একেবারে অসহায়, যাঁকে দেখাশোনার কেউ নেই এবং যিনি কম করে দশ বছর এই রাজ্যে বাস করছেন, তিনি এই সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনের জন্য ছাপানো ফর্ম ব্লক ও পৌরসভা অফিসে পাওয়া যায়।

গরিব মহিলাদের জন্য কাটিং ও টেলারিং প্রশিক্ষণ :

গরিব দুঃস্থ মহিলারা যাতে কাটিং ও টেলারিং শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন তার জন্য এই বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে এই রকম ৬৮টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক একটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেক মহিলাকে মাসে ২০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণ নিতে হলে যে ব্লকে এই কেন্দ্র রয়েছে সেখানে বিডিও -র কাছে আবেদন করতে হবে।

অক্ষম ও বয়স্কদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প:

একেবারে অসহায় গরিব অক্ষম বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা যাঁদের নিজস্ব আয়ের উৎস নেই, তাঁরা নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা বার্ধক্যভাতা পেতে পারেন। একবার মঞ্জুর হলে যতদিন বাঁচবেন ততদিন এই ভাতা পাবেন। এই ভাতা পেতে হলে ব্যক্তির বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি হতে হবে এবং কোন এলাকায় কম করে দশ বছর থাকতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য :

গরিব ও দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতিমাসে ৪০০ টাকা দেওয়ার একটি প্রকল্প রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের প্রতিবন্ধী (প্রতিবন্থকতার পরিমাণ হতে হয় ৪০শাংশ উপরে) এই সাহায্য পেতে পারেন।

তপশীলি উপজাতির মানুষদের উন্নয়নের জন্য বিসি ডবল্যু-এর বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নীচে দেওয়া হল—

বৃদ্ধ বয়সের পেনশন প্রকল্প: আই টি ডি এলাকায় বসবাসকারী বিপিএল পরিবারভুক্ত ৬০ বছরের বেশি বয়সের আদিবাসী বৃদ্ধদের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা ভাতার এক প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

শস্য ব্যাংক : ডবল্যু বি টি ডি সি -র অধীনে শস্য ব্যাংক গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য চরম দুর্দশার সময় বা অভাবী মরসুমে আদিবাসী পরিবারগুলিকে ঋণ হিসাবে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যায়। ফসল কাটার সময় এই ঋণ আদায় করা হয়।

আদিবাসী মহিলা স্বশক্তিকরণ যোজনা : গরিব আদিবাসী মহিলাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহজশর্তে ঋণ ও ভর্তুকি দেওয়া হয়। শালপাতার প্লেট তৈরি করতে, ঘরে বসে দুগ্ধ উৎপাদন, মুদির দোকান চালানো ইত্যাদির মাধ্যমে স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। যার মধ্যে বিপি এল পরিবারের জন্য সর্ব্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সাপেক্ষে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সরকার ভর্তুকি দেয়।

আয়ের ব্যবস্থা:

উপজাতিদের আয়ের ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্প রূপায়ন করতে তিনটি আর্থিক সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলি হল—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ তপশীলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও অর্থসংস্থান কর্পোরেশন

(খ) পশ্চিমবঙ্গ তপশীলি উপজাতি উন্নয়ন কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাদপদ শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থসংস্থান কর্পোরেশন।

পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাদপদ শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থসংস্থান কর্পোরেশন দুটি বড় প্রকল্প চালায়। সেগুলি হল এস সি পি (স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান) ও টি এস পি (ট্রাইবাল সাব প্ল্যান)। আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাংক ঋণ, মার্জিনমানি ও ভর্তুকির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হয়।

শিক্ষামূলক প্রকল্প:

উপজাতি পরিবারের শিক্ষার্থীদের বই কেনার জন্য অনুদান দেওয়া, মেধাবিদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা, হোস্টেলের খরচ দেওয়া ও বিশেষ স্থাপন করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

গরিব অথচ মেধাবী এমন উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের যারা শহরে মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা চালাতে চায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটি প্রকল্প আছে।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসে পড়া উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষার জন্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়িতে ৫টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল আছে। প্রতিটি স্কুলের ছাত্রক্ষমতা ৪২০।

এছাড়া তপশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতিসহ সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য রয়েছে নানা প্রকল্প।

অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬:

২০০৬ -এর ১৮ ডিসেম্বর সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাস হয় 'তপশিলি উপজাতি এবং বংশানুক্রমিক অন্যান্য অরণ্যচারী সম্প্রদায় (আরণ্যের অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬'। ভবিষ্যতে এদেশের অরণ্যানির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে এবং বিভিন্ন আদিবাসী ও অরণ্যবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতিদানের এই আইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অরণ্যবাসী হতদরিদ্র মানুষকে বারংবার উচ্ছেদ করা হয়েছে যেহেতু তাদের কাছে যথোপযুক্ত নথি বা অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী কোনও দলিল নেই। অরণ্যের উপর নির্ভরশীল এই সব মানুষদের নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে সেই জমিকে লাগানো হয়েছে নানা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ের দোহাই দিয়ে ২০০২ সালের ৩ মে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এক নির্দেশনামা জারি করে। ঐ নির্দেশনামায় ঐ বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর বন থেকে সমস্ত দখলদারকে উচ্ছেদ করতে বলা হয়। প্রায় দু বছর ধরে সারাদেশে ৩ লক্ষ পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়।

কোনও কোনও জায়গায় গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করতে হাতিকে কাজে লাগানো হয়। কোথাও কোথাও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অসংখ্য মানুষ বাড়িঘর, রুটিরুজি হারিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। বহু মানুষ মারা যান। এরপর ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নের সুপারিশ জানায় জাতীয় উপদেষ্টা কমিশন।

সুতরাং অরণ্যবাসী মানুষের অধিকারের প্রশ্নে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই আইনের ফলে অরণ্যবাসী মানুষেরা চার রকমের অধিকার অর্জন করেছেন।

(ক) নাম - সত্ত্ব - অধিকার :

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫ -এর অবস্তান - সাপেক্ষে অরণ্যের বাসিন্দা যে কোনও পরিবারপিছু নিজ দখলে থাকা সর্বোচ্চ ৪ হেক্টর পরিমাণ প্রকৃত চাষযোগ্য জমির আইনী সত্ব ওই পরিবারের অনুকূলে মঞ্জুর করা হবে।

(খ) উপযোগিতা ব্যবহারের অধিকার:

ছোটখাটো বন সম্পদ (নিজ নামে স্বত্বাধিকারসহ), চারণক্ষেত্রে ও চারণপথ ব্যবহারের অধিকার।

(গ) খয়রাতি ও উন্নয়নের অধিকার:

বনাঞ্চলের সুরক্ষার সাপেক্ষে অবৈধ উচ্ছেদ বা বলপূর্বক অপসারণ ঘটলে পুনর্বাসন পাওয়ার অধিকার।

(ঘ) বনভূমি তদারকি অধিকার :

সর্বতোভাবে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার অধিকার।

এই আইনের সার্থক দাবিদাররূপে গণ্য হতে গেলে দাবিদারকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বীকৃত তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর সদস্য হতে হবে। কিংবা সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলে ৭৫ বছরের বসিন্দা হতে হবে।

দাবিদারের মূল বাসভূমি হতে হবে সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চল। সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে অরণ্য ও অরণ্য - জমির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আবেদনকারীর নাম, দাবির সমস্ত বিবরণ নথিভুক্ত করবে গ্রামসভা। গ্রামসভা নিযুক্ত অরণ্যের অধিকার কমিটি এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবে এবং এই কমিটির অনুসন্ধানের প্রতিবেদন অনুমোদন করবে গ্রামসভা। এরপর যথাক্রমে তালুক ও জেলাস্তরে গ্রামসভা সুপারিশ খতিয়ে দেখা হবে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জেলাস্তরের কমিটি। তালুক বা জেলাস্তরে মিথ্যা দাবির ঘটনা কারো নজরে এলে তিনি সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে আবেদন জানাতে পারেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এই অধিকার বাতিল করা হবে। এই আইনের আওতায় প্রদত্ত জমি বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই আইনে দরখাস্ত দাখিল করার প্রণালী খুবই জটিল। সেইসঙ্গে গ্রামসভাগুলির জাতপাত ও রাজনীতির খপ্পরে পড়ে ন্যায়বিচার বহুক্ষেত্রে অধরা থেকে যাচ্ছে।

প্রকৃত ব্যক্তিরা বহুক্ষেত্রে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেইসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল—প্রাপ্ত জমিকে উন্নয়নের নামে অধিগ্রহণ আইনের আওতাবহির্ভূত করার সংস্থানও এই আইনে নেই।

শিক্ষিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষকে এমন উদ্যোগ নিতে হবে যাতে গরিব মানুষ তাদের অধিকারগুলো চিনতে পারে, জানতে পারে। তাহলেই রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙে তারা তাদের অধিকারগুলো ছিনিয়ে নিতে পারবে। আর তাদের প্রাপ্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা ঠিকমতো পেলেই আদিবাসীসহ গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জীবনধারণের সমস্যা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র : যোজনা সেপ্টেম্বর ২০০৮, যোজনা আগষ্ট ২০০৮, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ); নবরূপে পঞ্চায়েতী রাজ (পশ্চিমবহগ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমচার পত্র, আগষ্ট ২০০৮); আনন্দবাজার পত্রিকা, এছাড়া বর্তমান, দৈনিক স্টেটম্যাসন।